সোনালী আশা

সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)

সোনালী আশা

"প্লাবনভূমিতে প্রচলিত জাতের মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাষীদের কর্মসংস্থান, আয় ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প

আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়
ফাইন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (ফেডেক) প্রকল্প
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাস্তবায়নে
সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)

সোনালী আশা

প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০১৩

রচনা
মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম

সম্পাদনা
এম এ সামাদ
সুকুমার দেব রায়
মুজিবর রহমান
মামুনুর রশিদ

অর্থায়ন ও সার্বিক সহযোগিতা
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশক
সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)
১০৯ পার্ক রোড (দোতলা)
নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী
ঢাকা-১২০৬
ফোনঃ ৮৭১৩১৩৭, ৮৭১১২১৫
মোবাইলঃ ০১৭১৪১৬৬১২৫
ই-মেইলঃ ccdabd@gnbd.net.bd

ভূমিকা

কুমিল্লা জেলার নিম্নাঞ্চল তথা তিতাস-গোমতী অববাহিকায় দাউদকান্দি, মুরাদনগর ও তিতাস উপজেলার নিম্ন এলাকায় নদীর উপচে পড়া পানি বা অতিবৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে প্লাবনভূমিতে পরিণত হয়। বর্ষাকাল এবং বর্ষা পরবর্তী সময় মিলিয়ে প্রায় ৫-৬ মাস পানির নীচে থাকায় এ সময়ে এসব জমিতে ধান বা অন্যান্য ফসল চাষ করা সম্ভব হয়না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ রাস্তা, সড়ক, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের ফলে প্রচুর পরিমাণ বদ্ধ এবং আধাবদ্ধ জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় এ ধরনের প্লাবনভূমির পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার একশত পঁচাত্তর একর (২,৫০০ হেক্টর)। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জলাবদ্ধ প্লাবনভূমির কিছু কিছু সংস্কার ও বাঁধ দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করে জমির মালিকরা সমিতি গঠন করে মাছ চাষ করে আসছেন। বর্ষায় অনাবাদী কৃষি জমিতে মাছ চাষের ফলে ফসল না হওয়া জনিত ক্ষতি হতে জমির মালিকরা রক্ষা পেয়েছেন। এসব জলাভূমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ মূলত কার্প জাতীয় মাছ চাষ হয়ে আসছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে এসব জলাশয়ে লাভজনকভাবে গলদা চিংড়ি চাষ করা সম্ভব। গলদা চিংড়ি চাষে অতিরিক্ত কোন খাবার খরচ বা পরিচর্যার দরকার হয়না। শুধুমাত্র পোনার মূল্য হিসাবে স্বল্প বিনিয়োগে একটি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করা যায়। প্লাবনভূমি অঞ্চলে কার্প জাতীয় মাছের সাথে উচ্চ মূল্যের গলদা চিংড়ি চাষ প্রচলনের মাধ্যমে মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা সিসিডি-এর উদ্যোগে "প্লাবনভূমিতে প্রচলিত জাতের মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার ও চান্দিনা উপজেলা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলায় বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভূক্ত চাষীরা প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তা পেয়েছেন।

এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে চাষীরা কার্পজাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে জলাশয় প্রস্তুতকরণ, পোনা মওজুদের উপযুক্ত সময়, গলদা চিংড়ির পোনা মওজুদের হার, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, গলদা চিংড়ি আহরণ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাষীরা বর্তমানে প্রশিক্ষণের শিক্ষণ অনুযায়ী লাভজনকভাবে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ করছেন। বর্তমানে প্রকল্পভূক্ত এবং প্রকল্প বহির্ভূত ৫৮০ জন চাষী এ মিশ্র চাষে অভ্যস্ত হয়েছেন। যে সকল জলাশয়ে উচ্চ মূল্যের এ জাতীয় মাছের নিবিড় চাষ হয়েছে সে সব জলাশয়ে একর প্রতি চাষীদের আরো ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় হয়েছে।

এ পর্যন্ত ৬১টি মৎস্য চাষ প্রকল্পের ১,৯৪৫ একর জলাশয় কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের আওতায় এসেছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৬১টি জলাশয়ে গলদা চিংড়ির মোট উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৯০,০০০ কেজি যা প্রতি কেজি ৭০০ টাকা দরে বিক্রি করে চাষীরা আয় করেছেন ৬,১২,৫০,০০০ টাকা।

পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাবে অনেক চাষী কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ জুভেনাইল মওজুদ করতে পারছেননা। এ অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে ফেডেক প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ এবং সিসিডিএ-র যৌথ অর্থায়নে গলদা চিংড়ির পিএল (পোস্ট লার্ভা) উৎপাদনের একটি হ্যাচারী স্থাপন করা হয়েছে। হ্যাচারী থেকে এ বছর গলদা চিংড়ির পিএল সফলভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে এ অঞ্চলের চাষীরা প্রয়োজনমত জুভেনাইল মওজুদ করতে পারবেন। বাস্তবায়িত এ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং প্রভাবসমূহ তুলে ধরে প্রকাশিত এই বই দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্লাবনভূমির মাছ চাষীদের গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান সাব-সেক্টর উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর এই ধরনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মুহম্মদ শহীদুল ইসলাম

গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ

গলদা চিংড়ির পরিচিতি, স্বভাব এবং বৈশিষ্ট্য ঃ গল্দা চিংড়ি একটি সন্ধিপদ বিশিষ্ট অমেরুদন্ডী প্রাণী। বৈজ্ঞানিক নাম (Macrobrachium rosenbergii)। এরা স্বভাবগতভাবে নিশাচর, স্বভোজী (Canabolistic)। বৈরী পরিবেশে এরা গর্ত করে পুরো শরীরটাকে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখে। ঠান্ডা পরিবেশে অনেক সময় পানি থেকে ডাংগায় উঠে আসে। প্রতি অমাবশ্যা ও পূর্ণিমায় সাধারণতঃ খোলস বদলায়। এদের চোখের গঠন পুঞ্জা এবং এরা ৩-৪ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। গলদা চিংড়ি পৃথিবীর অনেক দেশে পাওয়া যায়। এর মধ্যে চীন, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ভারত, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, হাওয়াই, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ অন্যতম। চাষের সুযোগের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে প্রথম স্থান দখল করে আছে বাংলাদেশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমদের সর্ব্বোচ্চ স্বাদু পানির জলাশয় থাকা সত্ত্বেও উচ্চমূল্যমানের এ জলজ সম্পদ চাষের সম্প্রসারণ আশানুরূপ করা সম্ভব হয়নি।

আমাদের দেশে ষাটের দশকের আগেও খালে, বিলে, ধানক্ষেতে, দিঘি ও পুকুরে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত গলদা চিংড়ি পাওয়া যেত। ষাটের দশকে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে উচ্চফলনশীল ধানের আবাদ করতে গিয়ে আমরা নিজেদের অনেক ক্ষতি অজান্তেই করে ফেলেছি। ধানের ক্ষেতের পোকা দমন করতে গিয়ে নির্বিচারে কীটনাশক ও অজৈব সারের ব্যবহারের ফলে প্রকৃতিতে জন্ম নেয়া অনেক মাছের প্রজাতিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে গলদা চিংড়ি প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রায় বিলুপ্তির পথে। গলদা চিংড়ি একটি কাঁটাবিহীন অধিক আমিষযুক্ত সুস্বাদু খাবার। সুস্বাদু এ মাছের বিশ্বব্যাপী রয়েছে ব্যাপক কদর। বহির্বিশ্বে রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে চিংড়ির বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় ১৯৮৮ সনে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর কদর ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় এবং প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণের জন্য এর চাষ সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নেই।

চাষ পদ্ধতি ঃ সব ধরনের চাষ সম্প্রসারণের পূর্ব শর্ত হলো সুস্থ সবল উন্নত জাতের চারা/পোনা। তার আগে প্রয়োজন এর চাষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা। কি ধরনের পানি ও মাটি চিংড়ি চাষের জন্য পরিবেশ বান্ধব এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। গলদা চিংড়ি চাষের জন্য অন্যান্য মাছের মত দুই ধরনের চাষের দরকার হয়। একটি হল প্রকৃতি থেকে/হ্যাচারী থেকে আহরিত পিএল (পোস্ট লার্ভা) নার্সারী পুকুরে যথাযথ নিয়মানুসারে লালন-পালনের মাধ্যমে জুভেনাইল উৎপাদন। অন্যটি হল উৎপাদিত জুভেনাইল মওজুদ পুকুরে চাষের মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন। সরাসরি চাষে ছাড়লে ফলাফল ভাল হবেনা, তাই পিএল- কে জুভেনাইল বা কিশোর পোনায় রূপান্তরিত করার জন্য নার্সারী পুকুরে এদের চাষ করতে হবে।

নার্সারী পুকুরের প্রয়োজনীয়তা ঃ অন্যান্য চাষযোগ্য প্রজাতির মত গলদা চিংড়ির বেলায়ও নার্সারী পুকুরে পিএল (post larvae) চাষ অতীব প্রয়োজনীয়। পিএল সরাসরি মওজুদ পুকুরে ছাড়লে এর বাঁচার হার এবং বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয়না। ফলে মওজুদকৃত পিএল হতে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায়না। এছাড়া গলদা চিংড়ির বেলায় স্ত্রী ও পুরুষ সনাক্ত করে মওজুদ পুকুরে ছাড়তে পারলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। কারণ পুরুষ জুভেনাইল দ্রুত বেড়ে উঠে। সাধারণত নার্সারী পুকুরে ৫/৬ সপ্তাহ লালন-পালন করলে পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি সহজেই সনাক্ত করা যায়। এছাড়া নার্সারী পুকুরটি ভালোভাবে প্রস্তুত করলে ৫-৬ সপ্তাহ পর এদের বাঁচার হার ও সাঁতার কাটার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

নার্সারী পুকুর একটি বিশেষভাবে প্রস্তুতকৃত পিএল-এর আবাসস্থল। নার্সারী পুকুরের মাটি সাধারণত বেলে-দোঁআশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাদা বা এটেল মাটির পুকুর নির্বাচন করা উচিত নয়। মাটির পি-এইচ কমপক্ষে ৬.০ হওয়া বাঞ্ছনীয়। পানির পি-এইচ ৭-৮ এর মধ্যে হলে ভালো হয়। হার্ডনেস প্রতি লিটারে সর্বোচ্চ ৮০-১০০, এলকালিনিটি ৮০-১০০ গ্রাম হওয়া বাঞ্ছনীয়। পানির বিদ্যুৎ পরিবাহী ক্ষমতা স্বাভাবিক হতে হবে। ক্লোরাইডের মাত্রা ০১.১০৫ মি.গ্রা/লিঃ হতে হবে।

নার্সারী পুকুর প্রস্তুতি ঃ পুকুরের পাড় ভালো করে মেরামত করে নিতে হবে যাতে বৃষ্টির গড়ানি পানি পুকুরে না যেতে পারে। পুকুরের তলদেশের মাটি যদি অধিক কাঁদাযুক্ত হয় তাহলে কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে। কাদা সরানোর পর পুকুরের তলদেশে শতাংশে এক কেজি হারে ৬০ ভাগ ক্লোরিন সম্পন্ন ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে। তার একদিন পর শতাংশ প্রতি এক কেজি পাথুরে চুন ছোট ছোট নুড়ি করে সারা পুকুরে ছড়াতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে চুন তলদেশে গুলে দেয়া যাবেনা। চুন দেবার একদিন পর শতাংশ প্রতি এক কেজি কাঁচা লবণ (অপরিশোধিত লবণ) ছড়িয়ে দিতে হবে। লবণ ছড়ানোর পরদিন পুকুরে পানি দিতে হবে। পানি দেয়ার তিন দিন পর শতাংশে ১ ফুট গভীরতার জন্য ১৫ গ্রাম হারে রোটানন প্রয়োগ করতে হবে। রোটানন প্রয়োগের পর চট জাল দিয়ে টেনে মাছের পোনা ধরে ফেলতে হবে। এর তিন দিন পর পিএল ছাড়া যেতে পারে। পিএল ছাড়তে ৭ দিনের বেশি দেরি হলে পুনরায় রোটানন প্রয়োগ করে আমাছা ধরে ফেলতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন ধরনের গাফিলতি নার্সারীতে জুভেনাইল প্রাপ্তির হার কমে যাবে। পুকুরে পিএল ছাড়ার পূর্বেই শুকনো খেজুর/নারিকেল/তালের পাতা আবাস স্থল হিসাবে পানির নীচে পুতে দিতে হবে। আড়াআড়ি ভাবে ছোট ফাসের জালও টানিয়ে দেয়া যায়। পুকুর সম্পূর্ণ প্রস্তুত হলে শতাংশ প্রতি সর্ব্বোচ্চ ১০০০ পিএল ছাড়া যেতে পারে। পিএল ছাড়ার পূর্বেই পিএল-এর খাবার সংগ্রহ করে রাখতে হবে। পিএল ছাড়ার দিন বিকেল থেকেই রাতের বেলা খাবার প্রয়োগ শুরু করতে হবে।

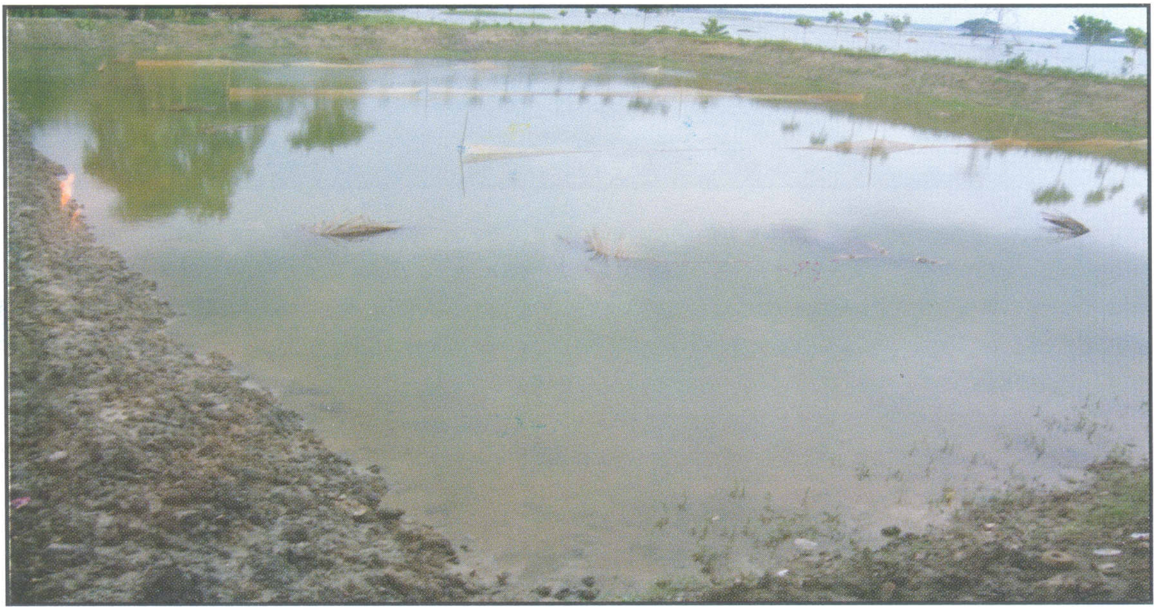

একটি আদর্শ নার্সারী পুকুর

নার্সারী পুকুরের খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ চিংড়ি একটি নিশাচর প্রাণী। তাই এদের খাবার রাতে সরবরাহ করাই উত্তম। খাবারের পরিমাণ প্রথমে শরীরের ওজনের ১০০ ভাগ থেকে শুরু করতে হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে চিংড়ির পোনা ধরে ওজন করে শরীরের ওজনের ৯০ ভাগ সরবরাহ করতে হবে। সব সময় খেয়াল রাখতে হবে মোট খাবার তিন ভাগ করে সন্ধ্যায়, রাতে এবং ভোর বেলায় সরবরাহ করা উত্তম। এমনি করে তৃতীয় সপ্তাহে ৭০ ভাগ, চতুর্থ সপ্তাহে ৬০ ভাগ এবং সর্বশেষ সপ্তাহে ৫০ ভাগ দিয়ে এক কেজিতে ৩০০-৩৫০টি জুভেনাইল হলে অবিলম্বে বিক্রি বা মওজুদের ব্যবস্থা করতে হবে। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার দিন খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দুই দিন আগে ও দুই দিন পরে মোট খাবারের অর্ধেক সরবরাহ করতে হবে।

নার্সারী পুকুরে উৎপাদিত জুভেনাইল

জুভেনাইল আহরণ ও পরিবহণ ঃ কখনো একবারে জুভেনাইল আহরণের চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ একবারে কখনো সব জুভেনাইল আসবেনা। সকাল অথবা বিকেল বেলায় আহরণ করা সবচেয়ে ভালো। পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় আহরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। অক্সিজেন সহযোগে পলিথিন ব্যাগে দূরত্ব ও পরিবহণের ধরনের উপর নির্ভর করে পোনার ঘনত্ব নির্ধারণ করার পর পোনা পরিবহণ করতে হবে। পরিবহণ ব্যাগের তাপমাত্রা ১৫-২০ ডিগ্রি হলে ভালো হয়।
২"-৩" আকারের জুভেনাইল হলে ৬-৮ ঘন্টা পরিবহণের জন্যে প্রতি ব্যাগে ১৫০-২০০টি করে নিতে হবে। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ইনসুলেটেড বক্স ব্যবহার করে প্রতি ব্যাগে ১ কেজি বরফ ও ১০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে কাছাকাছি হলে এলুমিনিয়ামের পাত্রের মুখে পাতলা জাল দিয়ে পরামর্শ মতে পরিবহণ করা উত্তম।

মওজুদ পুকুর প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা ঃ মওজুদ পুকুর বিভিন্ন রকমের হতে পারে। পুকুরের আয়তন কম-বেশি হতে পারে। তবে সর্ব ক্ষেত্রেই পানির গভীরতা একটি সহনীয় পর্যায়ের হতে হবে। তবে এটি কোনভাবেই ১.৫ মিটার অর্থাৎ ৪-৫ ফুটের বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অপোকৃত বড় জলাশয়ের প্রায় ৩০ ভাগ এলাকা স্বাভাবিক গভীরতা থেকে একটু বেশি গভীর হলে ভালো হয়। খোলামেলা জায়গায় পুকুর নির্বাচন করতে হবে। শুকনো মৌসুমে কমপক্ষে ১ মিটার পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বর্ষা মৌসুমে ২ মিটারের বেশি পানি হলে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। মওজুদ পুকুরে প্রতি একরে ৪০০০-৫০০০ জুভেনাইল ছাড়া যেতে পারে। নার্সারী পুকুরের মত বিঘাপ্রতি ৩-৪ কেজি ৬০ ভাগ ক্লোরিন সম্পন্ন ব্লিচিং পাউডার দিয়ে তলদেশ শোধন করে নিতে হবে। তারপর শতাংশ প্রতি ১ কেজি পাথুরে চুন না গুলে ছোট নুড়ি করে পুকুরের তলদেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। প্লাবন ভূমিতে ধান কাটা হয়ে গেলে ধানের গোড়া থাকতেই এ কাজটি করে ফেলতে হবে। মওজুদ পুকুরে অন্যান্য মাছের খাবার দেয়ার বেলায়ও অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কথাটি খেয়াল রাখতে হবে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন খাবার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে এবং তার দু দিন আগে ও দুদিন পরে মোট খাবারের অর্ধেক সরবরাহ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে মোট খাবার এক বারে বা দু বারে না দিয়ে তিন বা চার বার দিলে খাবারের ব্যবহার যথাযথ হয় এবং উৎপাদন বেশি পাওয়া যাবে।

মওজুদ পুকুরে জুভেনাইল ছাড়া ঃ মওজুদ পুকুরে জুভেনাইল ছাড়ার পূর্বে নার্সারী পুকুরের মত তাল, খেজুর বা নারিকেলের শুকনা পাতা দিয়ে আশ্রয়স্থল তৈরী করে দিতে হবে। তারপর শতাংশ প্রতি ৩০-৪০টি জুভেনাইল মওজুদ করা যেতে পারে। জুভেনাইল ছাড়ার পর লক্ষ্য রাখতে হবে অন্যান্য মাছের খাবার যেন সঠিকভাবে দেয়া হয়। মওজুদ পুকুরে রাক্ষুসে মাছ যেমন- চিতল, আইড়, বোয়াল, শোল, গজার মাছ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। জুভেনাইল ছাড়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মওজুদ পুকুরের পানির তাপমাত্রা ও জুভেনাইল বহনকারী পাত্রের তাপমাত্রা সমান করে নিতে হবে ।

অক্সিজেন সহযোগে জুভেনাইল পরিবহণ

মওজুদ পুকুরে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ঃ

পানির গুণাগুণ	সহনীয় মাত্রা	করণীয়
পিএইচ	৭-৮	কম বা বেশি হলে শতাংশে ২৫০ গ্রাম থেকে শুরু করে ২ কেজি পর্যন্ত পাথুরে চুন ৭২ ঘন্টা ভিজানোর পর ১০০ গুণ পানিতে তরল করে সকাল বেলা পুকুরে ছড়াতে হবে।
হার্ডনেস	৮০-১২০	সহনীয় মাত্রার বেশি হলে পানি অর্ধেক বদলে শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম হারে পাথুরে চুন, যদি মাছ থাকে তাহলে ৭২ ঘন্টা ভিজিয়ে ১০০ গুণ তরল করে ভোর বেলা প্রয়োগ করতে হবে। সহনীয় মাত্রায় আসা না পর্যন্ত সপ্তাহে দু বার প্রয়োগ করা অব্যাহত রাখতে হবে।
এলকালিনিটি	৮০-১২০	সহনীয় মাত্রার বেশি হলে পানি অর্ধেক বদলে শতাংশ প্রতি ২৫০ গ্রাম হারে পাথুরে চুন, যদি মাছ থাকে তাহলে ৭২ ঘন্টা ভিজিয়ে ১০০ গুণ তরল করে ভোর বেলা প্রয়োগ করতে হবে। সহনীয় মাত্রায় আসা না পর্যন্ত সপ্তাহে দু বার প্রয়োগ করা অব্যাহত রাখতে হবে।
এমোনিয়া	০.৫-১	৬০% ব্লিচিং পাউডার দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ তিন দিন পরপর তিনবার প্রয়োগ করতে হবে।
অক্সিজেন	৫-৬	পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ছোট লোলিফট পাম্প দিয়ে পুকুরের পানি পুকুরে উচু করে ফেলতে হবে। এ ছাড়া পটাসিয়াম পার ম্যাংগানেট ১ পিপিএম হারে প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে ।
তাপমাত্রার প্রভাব	২৮-৩০	সহনীয় মাত্রার বেশি হলে শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে অপরিশোধিত লবণ ভাল করে গুলে পানির উপরিভাগে প্রয়োগ করতে হবে।

গলদা চিংড়ির সম্ভাব্য রোগ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের উপায়সমূহ ঃ

ক্রমিক	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	প্রতিকার	ব্যবস্থাপনা
১	নরম খোলস	অমাবস্যা পূর্ণিমা ছাড়াও চিংড়ি ধরলে খুব নরম খোলস লক্ষ্য করা যাবে।	শতাংশ প্রতি ৫০০ গ্রাম চুন ভাল করে গুলে সারা পুকুরে ছড়াতে হবে।	পাথুরে চুন ৭২ ঘন্টা ভিজানোর পর ১০০ গুণ তরল করে ভোর বেলা ছড়াতে হবে।
২	খোলস ও মাংসের মধ্যে ফাঁক	চিংড়ি ধরে চাপ দিলে দেখা যাবে খোলস ও মাংসের মধ্যে ফাঁক রয়েছে।	এ অবস্থায় খাদ্য ব্যাবস্থাপনা উন্নত করতে হবে।	রাতের বেলা এক বার খাবার দিতে পারলে ভালো।
৩	লেজ পচা	চিংড়ি ধরলে দেখা যাবে লেজের অংশে পচন ধরেছে।	এ ক্ষেত্রে ১ পিপিএম হারে ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে।	স্থিরকৃত ব্লিচিং পাউডার ২০০ গুণ তরল করে ভোর বেলা ছড়াতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে কোন কণা যেন না থাকে। পাতলা কাপড় দিয়ে ছেকে নিলে ভাল হয়।

ক্রমিক নং	রোগের নাম	রোগের লক্ষণ	প্রতিকার	ব্যবস্থপনা
৪	এন্টেনা বা শুড় পড়া	চিংড়ির করাতের সামনে বেশ লম্বা শুড় থাকে। শুড় না থাকলে বুঝতে হবে পুরুষের জন্য পরিমাণ মত স্ত্রী চিংড়ি দেয়া হয় নাই।	নার্সারী পুকুর থেকে অবশিষ্ট চিংড়ির মধ্য থেকে পূর্বের মওজুদের সংখ্যার কমপক্ষে ৫% স্ত্রী চিংড়ি মওজুদ করতে হবে।	জাল টেনে বর্তমান মওজুদের পরিমাণ জেনে নিতে হবে।
৫	আলসারেটিভ সিন্ড্রোম	চিংড়ির শরীরে সাদা দাগ পড়বে। চিংড়ি পুকুরের কিনারে গোরাঘুরি করবে এবং মরতে থাকবে।	অবিলম্বে ১ পিপিএম হারে ৬০ ভাগ ক্লোরিন সম্পন্ন ব্লিচিং পাউডার নিয়ম মতো দিনে দু'বার ছড়াতে হবে।	৬০% ক্লোরিন নিশ্চিত করতে হবে।

মওজুদ পুকুরে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ঃ মওজুদ পুকুরে অন্যান্য মাছের পরিমাণ ও শরীরের ওজন প্রতি সপ্তাহে একবার সংগ্রহ করে সে অনুযায়ী খাবারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। খাবারের পরিমাণ কেবল মাত্র প্রজাতির সংখ্যা ও ওজন দিয়ে নির্ণয় করতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্য খায় এমন মাছের সংখ্যা ও ওজন বাদ দিতে হবে। পানির রং দেখে পরিমাণমত জৈব/অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। ভাসমান ও প্রাকৃতিক খাবার খায় এ ধরনের প্রজাতির সংখ্যা বেশি হলে সময় মত এদের আহরণ করে ফেলতে হবে। কারণ সংখ্যাধিক্য হলে রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে।

চিংড়ি আহরণ ঃ পুকুরে আগেভাগে জুভেনাইল মওজুদ করতে পারলে ৬/৭ মাসেই এরা আহরণের উপযুক্ত হয়। সাধারণতঃ নভেম্বর/ ডিসেম্বর মাসে আহরণ করাই উত্তম। তবে সারা বছর মাছ চাষ করা হয় এমন পুকুরের আহরণ বিলম্বিত করা যাবে। তবে বেশি শীত পড়লে বাঁচার হারে প্রভাব পড়তে পারে।

আহরণোত্তর পরিচর্যা ঃ চিংড়ি আহরণের পর ভালো করে ধুয়ে ঠান্ডা (বরফ গলা পানি) পানিতে ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর ৫০% বরফ দিয়ে বিক্রির জন্য প্যাকেট করতে হবে। তবে বরফের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য ৫% লবণ বরফে মিশানো যেতে পারে।

প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ ঃ কুমিল্লা জেলার নিম্নাঞ্চল তথা তিতাস-গোমতী আববাহিকায় দাউদকান্দি, মুরাদনগর ও তিতাস উপজেলার নিম্ন এলাকায় নদীর উপচে পড়া পানি বা অতিবৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে প্লাবন ভূমিতে পরিণত হয়। বর্ষাকাল এবং বর্ষা পরবর্তী সময় মিলিয়ে প্রায় ৭-৮ মাস পানির নীচে থাকায় এ সময়ে এসব জমিতে ধান বা অন্যান্য ফসল চাষ করা সম্ভব হয়না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ রাস্তা, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের ফলে প্রচুর পরিমান বদ্ধ এবং আধাবদ্ধ জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় এ ধরনের প্লাবন ভূমির পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার একশত পঁচাত্তর একর (২,৫০০ হেক্টর)। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জলাবদ্ধ প্লাবন ভূমির কিছু কিছু সংস্কার করে এবং বাঁধ দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করে জমির মালিকরা সমিতির মাধ্যমে মাছ চাষ করে আসছেন। বর্ষায় অনাবাদী কৃষি জমিতে মাছ চাষের ফলে ফসল না হওয়া জনিত ক্ষতি হতে জমির মালিকরা রক্ষা পেয়েছেন। এসব জলাভূমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ মূলত কার্প জাতীয় মাছ চাষ হয়ে আসছে। মাছ চাষ পরবর্তী এসব জমিতে এক মৌসুম ধান উৎপাদিত হয়। মাছ চাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ রক্ষায় ব্যবহৃত উপকরণ এসব জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ফলে মৌসুমী ধান চাষে কোন সার এবং কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়না। ধানের উৎপাদনও সাধারণ চাষের জমির চাইতে বেশি হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে এসব জলাশয়ে লাভজনকভাবে গলদা চিংড়ি চাষ করা সম্ভব। গলদা চিংড়ি চাষে অতিরিক্ত কোন খাবার বা পরিচর্যার দরকার হয়না। শুধুমাত্র পোনার মূল্য হিসাবে অত্যন্ত স্বল্প বিনিয়োগে একটি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এসব জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছের সাথে উচ্চ মূল্যমানের গলদা চিংড়ি চাষ প্রচলনের মাধ্যমে মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে "প্লাবন ভূমিতে প্রচলিত জাতের মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্লাবনভূমি অঞ্চলে মাছ চাষের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. সাধারণত দল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে।
২. বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দল থাকলেও কার্যত ব্যক্তি প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়।
৩. তহবিল সাধারণত নিজেদের চাঁদা হতে সংগৃহীত হয়।
৪. প্রয়োজনে স্থানীয় এনজিও থেকে ঋণ গ্রহণ করে এ চাষ পরিচালনা করা হয়ে থাকে।
৫. কোম্পানী গঠনের মাধ্যমে শেয়ার ভাগ করা হয়ে থাকে।
৬. স্থানীয়ভাবে কিছু মাছ বিক্রি হলেও বেশির ভাগ মাছই বরফ দিয়ে ট্রাকে করে চট্টগ্রাম ও ঢাকার পাইকারী বাজারে পাঠানো হয়।

গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষঃ মিশ্র চাষে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া, সিলভার কার্প ইত্যাদি মাছের সাথে একর প্রতি সর্বোচ্চ ৫,০০০ গলদা চিংড়ির জুভেনাইল মওজুদ করে দেহের ওজনের শতকরা ১০ ভাগ থেকে শুরু করে ৫ ভাগ পর্যন্ত খাবার দিয়ে গলদা চিংড়ির একটি ভালো ফলন আশা করা যায়। কোনভাবেই জৈষ্ঠ মাসের পর জুভেনাইল ছাড়া যাবেনা। পুকুরের প্রকারভেদে এবং অন্যান্য প্রজাতির মাছের অনুপাতে গলদা চিংড়ির জুভেনাইল মওজুদের সংখ্যা নিরূপণ করতে

মিশ্র চাষে বিভিন্ন ধরনের মাছের পোনা মওজুদের ক্ষেত্রে আদর্শ অনুপাত নিম্নরূপঃ

বিভিন্ন ধরনের মাছের পোনা মওজুদ (শতাংশ প্রতি)

মাছের প্রজাতি	সংখ্যা
কাতল	৫-৭ টি
সিলভার কার্প	২০-২৫টি
রুই	৩-৫টি
মৃগেল	২-৩টি
তেলাপিয়া	২৫-৪০টি
বাটা	৩০-৩৫টি
পাঙ্গাস	৫-৬টি
কার্পিও	১-২টি
গলদা চিংড়ি	১৫-২০ টি

গলদা চিংড়ির হ্যাচারী স্থাপন

পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে দুই ধাপে বাস্তবায়িত "প্লাবন ভূমিতে প্রচলিত জাতের মাছের সাথে গলদা চিংড়ির চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাষীদের কর্মসংস্থান, আয় ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" বাস্তবায়নের ফলে এ পর্যন্ত এ অঞ্চলের ৬১টি মৎস্য খামারের ১,৯৪৫ একর জলাশয় গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের আওতায় এসেছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ অঞ্চলে গলদা চিংড়ির মোট উৎপাদন হয়েছে ৯০,০০০ কেজি যা থেকে চাষীদের আয় হয়েছে প্রায় ৬,১২,৫০,০০০ টাকা। উচ্চ মূল্যমানের এ মাছ চাষে চাষীদের আয় একর প্রতি ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক চাষী এ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এ প্রেক্ষিতে এ অঞ্চলে গলদার পিএল-এর চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় কোন গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনের হ্যাচারী না থাকায় খুলনা ও বাগেরহাট অঞ্চল থেকে চিংড়ির পিএল সংগ্রহ করতে হচ্ছে , যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিবহণকালীন সময়ে মারা যায়। এ পর্যন্ত কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি, মুরাদনগর, তিতাস, মেঘনা, চান্দিনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া ও নবীনগর উপজেলায় গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ সকল এলাকায় চিংড়ি চাষ সম্প্রসারিত হলে ৪-৫ কোটি জুভেনাইলের প্রয়োজন হবে। কিন্তু প্রয়োজন মাফিক পিএল প্রাপ্তির অভাবে এ মিশ্র চাষ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

এ অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং সিসিডিএ-র যৌথ অর্থায়নে "গলদা চিংড়ির হ্যাচারী স্থাপন" শীর্ষক একটি ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নে বছরে চল্লিশ লক্ষ পিএল উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি হ্যাচারী স্থাপিত হয়েছে। ফিশারিজ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ হ্যাচারীতে চলতি মৌসুমে সফলভাবে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর ফলে প্রকল্প এলাকার গলদা চিংড়ির পিএল- এর চাহিদার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মেটানো সম্ভব হবে।

ফেডেক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত হ্যাচারী

গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ ঃ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি

গলদা চিংড়ি চাষের গুরুত্ব ঃ বাংলাদেশে স্বাদু পানির প্রায় সকল জলাশয়ে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ প্রবর্তন সম্ভব। চিংড়ি একটি অত্যন্ত উচ্চ মূল্যমানের রপ্তানীযোগ্য পণ্য। রপ্তানী ছাড়াও স্থানীয় বাজারে রয়েছে এর ব্যাপক চাহিদা। জলজ প্রাণীর মধ্যে চিংড়িতে আমিষের পরিমাণ অনেক বেশি, যা প্রায় ৫০-৬০ ভাগ। মিশ্র চাষে চিংড়ির জন্যে আলাদা কোন খাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয়না। বিভিন্ন কারণে বাগদা চিংড়ির রপ্তানী বাধাগ্রস্ত হলেও গলদা চিংড়ির রপ্তানী বাজার দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। কাঁকড়া ও বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হয় কিন্তু গলদা চিংড়ি স্বাদু পানিতে চাষযোগ্য। দেশের বিস্তীর্ণ স্বাদু পানির জলাশয়ে বিভিন্ন কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটানো সম্ভব হলে দেশে আমিষের ঘাটতি মেটানো যেমন সম্ভব হবে, তেমনি উচ্চ মূল্যমানের এ জলজ সম্পদের চাষ আমাদের দেশের মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া ব্যাপকহারে স্বাদু পানিতে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ প্রচলন আমাদের রপ্তানী আয়ের প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা ঃ কুমিল্লা জেলার নিম্নাঞ্চল তথা তিতাস-গোমতী আববাহিকায় দাউদকান্দি, মুরাদনগর ও তিতাস উপজেলার নিম্ন এলাকায় নদীর উপচে পড়া পানি বা অতিবৃষ্টির ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে প্লাবন ভূমিতে পরিণত হয়। বর্ষাকাল ও বর্ষা পরবর্তী সময় মিলিয়ে প্রায় ৭-৮ মাস পানির নীচে থাকায় এসময়ে এসব জমিতে ধান বা অন্যান্য ফসল চাষ করা সম্ভব হয়না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গ্রামীণ রাস্তা, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের ফলে প্রচুর পরিমাণ বদ্ধ ও আধাবদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। শুধুমাত্র কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলায় এ ধরনের প্লাবন ভূমির পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার একশত পঁচাত্তর একর (২,৫০০ হেক্টর)। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জলাবদ্ধ প্লাবন ভূমির কিছু কিছু সংস্কার করে ও বাঁধ দিয়ে বেষ্টনী তৈরী করে জমির মালিকরা সমিতি গঠন করে মাছ চাষ করে আসছেন। বর্ষায় অনাবাদী কৃষি জমিতে মাছ চাষের ফলে ফসল না হওয়া জনিত ক্ষতি হতে জমির মালিকরা রক্ষা পেয়েছেন। এসব জলাভূমিতে দীর্ঘদিন যাবৎ মূলত কার্প জাতীয় মাছ চাষ হয়ে আসছে। মাছ চাষ পরবর্তী এসব জমিতে এক মৌসুম ধান উৎপাদিত হয়। মাছ চাষে মাটি ও পানির গুণাগুণ রক্ষায় ব্যবহৃত উপকরণ এসব জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ফলে মৌসুমী ধান চাষে কোন সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়না, ধানের উৎপাদনও সাধারণ চাষের জমির চাইতে বেশি হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে এসব জলাশয়ে লাভজনকভাবে গলদা চিংড়ির চাষ করা সম্ভব। গলদা চিংড়ি চাষে অতিরিক্ত কোন খাবার বা পরিচর্যার দরকার হয়না। শুধুমাত্র পোনার মূল্য হিসাবে অত্যন্ত স্বল্প বিনিয়োগে একটি অর্থকরী ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এসব জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছের সাথে উচ্চ মূল্যমানের গলদা চিংড়ির চাষ প্রচলনের মাধ্যমে মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে "প্লাবন ভূমিতে প্রচলিত জাতের মাছের সাথে গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য ঃ কর্ম এলাকায় অর্থকরী ফসল হিসাবে গলদা চিংড়ির চাষ প্রচলন ও এর মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ঃ সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

- বর্তমানে চাষকৃত মাছের সাথে উচ্চমূল্যের গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ প্রবর্তন করা;
- মাছ চাষে আধুনিক চাষ প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো;
- স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে একর প্রতি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- নার্সারী স্থাপনসহ গলদা চাষে নতুন উদ্যোক্তার অন্তর্ভূক্তি;
- প্লাবন ভূমি অঞ্চলের মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধি;
- প্রকল্প এলাকায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

প্রকল্পের নাম	"প্লাবনভূমিতে প্রচলিত জাতের মাছের সাথে চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ"
প্রকল্পের মেয়াদকাল	এক বছর ছয় মাস
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	৯ই এপ্রিল, ২০১২ থেকে ৮ই অক্টোবর, ২০১৩ পর্যন্ত
প্রকল্পেরউপকারভোগী	প্লাবন ভূমি অঞ্চলের চিংড়ি চাষী
প্রকল্পের উপকারভোগী উদ্যোক্তার সংখ্যা	৩৬০ জন
প্রকল্পের কর্ম এলাকা	কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার ও চান্দিনা উপজেলা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলা
প্রকল্পের মোট বাজেট	৪৭,১৭,২৩০ (সাতচল্লিশ লক্ষ সতের হাজার দুইশত ত্রিশ) টাকা
পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত অনুদান	২৯,৮৮,০৯০ (উনত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার নব্বই) টাকা
সিসিডিএ-র অবদান	১৭,২৯,১৪০ (সতের লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশত চল্লিশ) টাকা

প্রকল্পের কর্ম এলাকা : কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার ও চান্দিনা উপজেলা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া উপজেলা।

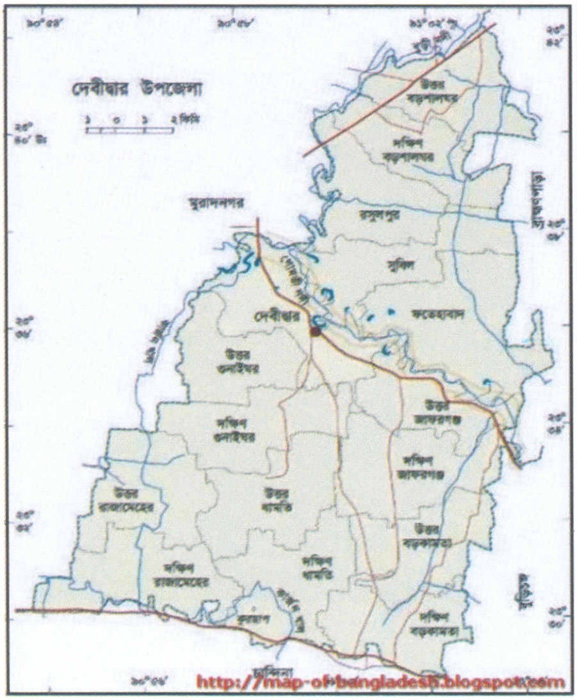

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

১.০ প্লাবন ভূমিতে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ঃ
কুমিল্লা অঞ্চলের প্লাবনভূমিগুলোতে মৎস্যচাষীরা সমিতি গঠন করে যৌথভাবে মাছ চাষ করেন। জমির মালিকরা নিজেদের মধ্যে সমিতি গঠন করে অথবা মাৎস্য চাষীরা সমিতি গঠন করে চাষীদের নিকট হতে জমি লিজ নিয়ে এসব জলাশয়ে মাছ চাষ করেন। প্রত্যেক সমিতিতে ১৫-৫০ জন মৎস্য চাষীর অর্ন্তভূক্তি রয়েছে। প্রকল্পভূক্ত মৎস্য চাষীদের আওতায় পরিচালিত ৩০টি সমিতিতে গড়ে ১৮৫৮.৩৪ একর আয়তনের ৩০টি জলাশয় রয়েছে। কুমিল্লা জেলায় মৎস্য চাষের আওতায় এরকম প্লাবনভূমির সংখ্যা ৭৩টি।

এসব জলাশয়ে চাষীরা অনেক আগে হতেই কার্প জাতীয় মাছের সাথে নাইলোটিকা, পাঙ্গাস ইত্যাদি মাছ চাষ করে আসছেন। তাদের মাছ চাষ কার্যক্রমকে আরো অধিক লাভজনক করার উদ্দেশ্যে এসব জলাশয়ে কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের প্রচলন ঘটানোর লক্ষ্যে প্রকল্পভূক্ত ৩২০ জন চাষীকে এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে রিসোর্স পারসন হিসেবে মৎস্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে চাষীদের বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ ধারণা প্রদান করেন। এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে চাষীরা কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির চাষের ক্ষেত্রে জলাশয় প্রস্তুতকরণ, পোনা মওজুদের উপযুক্ত সময়, গলদা চিংড়ি পোনা মওজুদের হার, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবস্থাপনা, গলদা চিংড়ি আহরণ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চাষীরা বর্তমানে প্রশিক্ষণের শিক্ষণ অনুযায়ী লাভজনকভাবে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ করছেন।

২.০ গলদা চিংড়ির নার্সারী স্থাপন প্রশিক্ষণ ঃ অন্যান্য চাষযোগ্য প্রজাতির মত গলদা চিংড়ির বেলায়ও নার্সারী পুকুরে পিএল (post larvae) চাষ আবশ্যক। পিএল সরাসরি মওজুদ পুকুরে ছাড়লে এর বাঁচার হার হ্রাস পায় এবং বৃদ্ধি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হয়না। ফলে মওজুদকৃত পিএল থেকে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায় না। এছাড়া গলদা চিংড়ির বেলায় স্ত্রী ও পুরুষ সনাক্ত করে মওজুদ পুকুরে ছাড়তে পারলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। সাধারণতঃ নার্সারীতে ৫/৬ সপ্তাহ পালনের পর স্বাভাবিকভাবেই পুরুষ ও স্ত্রী চিংড়ি সনাক্ত করা যায়। এ ছাড়া নার্সারী পুকুরটি ভালোভাবে প্রস্তুত করলে ৫/৬ সপ্তাহ পর এদের সাঁতার কাটার ক্ষমতা ও বাঁচার হার বৃদ্ধি পায়। তাই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে চিংড়ির পিএল সংগ্রহ করে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় লালন-পালনের মাধ্যমে জুভেনাইল উৎপাদনের লক্ষ্যে ৪০ জন চাষীকে জুভেনাইল উৎপাদনের নার্সারী পুকুর স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে চাষীরা বিভিন্ন কারিগরি দিক জেনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগৃহীত পিএল হতে জুভেনাইল উৎপাদন করতে পারছেন। বর্তমানে চাষীরা তাদের প্রয়োজনীয় জুভেনাইলের উল্লেখযোগ্য অংশ নার্সারী পুকুর হতে সংগ্রহ করতে পারছেন।

৩.০ প্রদর্শনী নার্সারী স্থাপন ঃ গলদা চিংড়ির পিএল হতে জুভেনাইল উৎপাদনে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৪টি প্রদর্শনী নার্সারী স্থাপন করা হয়। পিএল হতে জুভেনাইল উৎপাদনে বিভিন্ন কারিগরি দিক যথাযথভাবে মেনে এসব প্রদর্শনী নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। এসব নার্সারীতে উৎপাদিত জুভেনাইল প্রকল্পভূক্ত মৎস্য চাষীদের গলদা চিংড়ির পোনার চাহিদা মেটাচ্ছে। দিন দিন প্লাবনভূমি অঞ্চলে কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের সম্প্রসারণ ঘটছে। এই প্রেক্ষিতে গলদা চিংড়ির জুভেনাইলের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরো অধিক সংখ্যক চাষী নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে পিএল হতে জুভেনাইল উৎপাদনের লাভজনক এ কার্যক্রমে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এর ফলে ভবিষ্যতে চাষীরা এসব নার্সারী হতে তাদের প্রয়োজনমত জুভেনাইল সংগ্রহ করতে পারবেন।

৪.০ শিক্ষা সফর ঃ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে গলদা চিংড়ির সফল মিশ্র চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করানোর উদ্দেশ্যে প্লাবনভূমি অঞ্চলের প্রকল্পভূক্ত ২০ জন চাষীর জন্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা থেকে কুমিল্লা জেলার প্লাবনভূমি এলাকায় শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়।

এক্সচেঞ্জ ভিজিটের সময় চাষীগণ নার্সারী পুকুরে উৎপাদিত জুভেনাইল দেখতে পেয়েছেন এবং সংশ্লিষ্ট চাষীর কাছ থেকে সংক্ষেপে নার্সারী পুকুরে পিএল চাষ বিষয়ে জানতে পেরেছেন। এছাড়া মিশ্র চাষের প্রজাতিসমুহের বিষয়ে স্থানীয় চাষীগণের কাছ থেকে তাদের সফলতার কাহিনী শুনে মিশ্র চাষে গল্দা চিংড়ি চাষের কথা জানতে পেরেছেন।

৫.০ ইস্যুভিত্তিক সভা আয়োজন ঃ প্লাবনভূমি অঞ্চলে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ কার্যক্রম একটি নতুন ধারণা। লাভজনকভাবে এ চাষে চাষীদের সমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে প্রতি তিন মাস পরপর উদ্ভূত সমস্যাসমূহ নিয়ে ইস্যু ভিত্তিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিভিন্ন বিষয়ের উপর এরকম আটটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। যে সমস্ত ইস্যু নিয়ে সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার, লবণের ব্যবহার, চুনের বদলে ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার, মাছের বৃদ্ধি যথাযথ না হওয়া, উন্নত মানের পোনা প্রাপ্তির সমস্যা, নতুন প্রজাতির অন্তর্ভূক্তিকরণ, নার্সারীতে রেণু পোনা ও পিএল বাঁচার হার নিরূপণ, মওজুদ ব্যবস্থাপনা, পিএল প্রাপ্তির সমস্যা, মাছ আহরণোত্তর পরিচর্যা, বরফের উত্তম ব্যবহার ইত্যাদি।

৬.০ অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজন ঃ প্রকল্পভূক্ত চাষীরা গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তা পরস্পরের মধ্যে শেয়ারের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে চাষীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রতিকূলতা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন।

৭.০ বাজার সংযোগ কর্মশালার আয়োজন ঃ মাছ চাষী, খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, মাছ চাষে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণের ব্যবসায়ী, মাছ ব্যবসায়ী, চিংড়ি রপ্তানীকারকদের অংশগ্রহণে বাজার সংযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে চাষীদের সাথে উপকরণ সরবরাহকারী, মাছ ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে চাষীরা তাদের উৎপাদিত চিংড়ি স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ীদের নিকট সহজেই বিক্রি করতে পারছেন। এছাড়া রপ্তানীকারকরা তাদের চাহিদামত মাছ চাষীদের নিকট হতে সংগ্রহ করে রপ্তানী করছেন।

৮.০ গলদা চিংড়ি পোনা সংগ্রহে সহায়তা প্রদান ঃ কুমিল্লা অঞ্চলে গলদা চিংড়ির পিএল-এর দুস্প্রাপ্যতা রয়েছে। তাই খুলনা, নোয়াখালী ও বাগেরহাট অঞ্চলে অবস্থিত হ্যাচারীর সাথে প্লাবনভূমি অঞ্চলের মাছ চাষীদের সংযোগ করিয়ে দেয়া হয়। সেখান থেকে চাষীরা পিএল সংগ্রহ করছেন। তবে অনেক দূরে অবস্থিত এসব হ্যাচারী হতে সংগৃহীত পিএল পরিবহণকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মারা যায়। ফলে প্রকল্প এলাকার মাছ চাষীরা চাহিদা মত পিএল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে ফেডেক প্রকল্পের আওতায় গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনের একটি হ্যাচারী স্থাপিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে চলতি মৌসুমে এটিতে সফলভাবে পিএল উৎপাদন সম্ভব হবে। ফলে এ অসুবিধা অচিরেই দূর হবে।

৯.০ সার্বক্ষণিক কারিগরি পরামর্শ সেবা প্রদান ঃ প্লাবনভূমি অঞ্চলে প্রচলিত জাতের কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ সম্পূর্ণ নতুন ধারণা। এ মিশ্র চাষে গলদা চিংড়ির জন্যে কোন অতিরিক্ত খাবার প্রয়োগের প্রয়োজন না হলেও পুকুর প্রস্তুতকরণ ও চাষ কার্যক্রমে কিছুটা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ফিশারিজ বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রিধারী প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণ প্রকল্পভূক্ত মাছ চাষীদের কার্যক্রম নিয়মিত পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছেন। এ চাষ পরিচালনা করতে গিয়ে চাষীরা তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে টেলিফোনের মাধ্যমে চাষীরা জরুরী পরামর্শ গ্রহণ করেছেন।

প্রকল্পের প্রভাব

প্লাবনভূমি অঞ্চলে প্রচলিত জাতের মাছের সাথে উচ্চ মূল্যমানের গলদা চিংড়ির চাষ প্রচলনের মাধ্যমে মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পের কারিগরি কর্মকর্তার সার্বক্ষণিক তদারকি এবং পরামর্শ সেবার ফলে প্রকল্পভূক্ত চাষীরা লাভজনকভাবে গলদা চিংড়ি চাষে অভ্যস্ত হয়েছেন। বর্তমানে প্রকল্পভূক্ত ও প্রকল্প বহির্ভূত ৪৮০ জন চাষী এ মিশ্র চাষে অভ্যস্ত হয়েছেন। এর ফলে চাষীদের আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রকল্প বহির্ভূত অন্যান্য চাষীদেরকে এ ধরনের চাষ কার্যক্রমে আগ্রহী করে তুলছে। বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের প্রভাবে চাষীরা পূর্বের তুলনায় আরো বেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষে অভ্যস্ত হয়েছেন। গলদা চিংড়ি চাষের ফলে চাষীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মাছ চাষের আওতা বৃদ্ধিসহ আরো অধিক সংখ্যক চাষীকে মাছ চাষে আগ্রহী করছে।

১.০ প্লাবনভূমি অঞ্চলে গলদা চিংড়ির চাষ প্রচলন ঃ কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদার জুভেনাইল মওজুদ ছাড়া কোন ধরনের অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই এ মিশ্র চাষ প্রচলনের মাধ্যমে মাছ চাষীদের আয় অনেক বেশী বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ বিষয়টি প্রকল্পভূক্ত চাষীরা অনুধাবন করতে সম হয়েছেন। ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক চাষী এ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

২.০ পানি বিশুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে লবণ ও ব্লিচিং পাউডারের ব্যবহার প্রচলন ঃ মাছ চাষের জলাশয়ে লবণ ব্যবহারের ফলে রোগ সৃষ্টিকারী পরজীবী ধ্বংস করে, পানির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে শীত প্রধান দেশের মাছ যেমন- সিলভার কার্প, বিগহেড, গ্রাসকার্প-এর অকাল মৃত্যু রোধ করে এবং সাধারণ পেট খারাপ জনিত অসুখ নিরাময় করে। ব্লিচিং পাউডার পানির মধ্যে থাকা ৬টি দুর্বল ভাইরাসসহ আলসারেটিভ সিন্ড্রোম রোগের প্রতিরোধ করে। এছাড়া পানিতে থাকা সকল প্রকার জীবাণু (যক্ষার জীবাণু সহ) ধ্বংস করে মাছের জন্য একটি নিরাপদ আবাসস্থলের পরিবেশ সৃষ্টি করে। প্রকল্পভূক্ত এলাকায় ইতঃপূর্বে মাছ চাষের জলাশয়ে লবণ ও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হতোনা। এর ফলে শীতকালে মাছের বৃদ্ধি যথাযথ হতোনা এবং মাছের মৃত্যুহার বেশি ছিল। বর্তমানে চাষীরা এসব অসুবিধা মোকাবিলা করে লাভজনকভাবে মাছ চাষ করছেন।

৩.০ রোগ নিরাময়ে ব্যবস্থাদি ঃ অন্যান্য চাষের মত মাছ চাষের যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল রোগ নিরাময়ের চাইতে রোগ প্রতিরোধ করা। পূর্বে রোগ প্রতিরোধের জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হতোনা ফলে গরমে এবং ঠান্ডায় অনেক মাছ মারা যেতো এবং চাষীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হতেন। কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হলে চুন প্রয়োগ করা হতো। ঘা/ক্ষত রোগ হলে অনেক সময় লবণও প্রয়োগ করা হতো। এখন চাষীগণ চাষের পূর্বেই পরিমাণমত ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করছেন। ফলে কোন প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব হয়না। পূর্বে যে সমস্ত রোগ মহামারী আকারেও দেখা দিত, বিশেষ করে এন্টারাইটিস রোগ, যা মাছকে তার হজম প্রক্রিয়া দুর্বল করে মেরে ফেলতো। এবং ভাদ্র মাসে প্রচন্ড গরমে সিলভার কার্প ও বিগহেড কার্প মারা যেতো, যেটি বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে।

৪.০ অপরিশোধিত গোবর ও মুরগির বিষ্ঠার ব্যবহার রোধ ঃ পূর্বে চাষীরা প্রাকৃতিক খাবার জন্মানোর জন্য অপরিশোধিত গোবর ও মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করতেন যার কোন প্রয়োজন ছিলনা। এর ফলে পেটের পীড়াজনিত রোগ ও পানির গুণাগুণ নষ্ট হয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ে মাছের মড়ক দেখা দিত। ইস্যু ভিত্তিক সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে চাষীরা এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এর ফলে বর্তমানে চাষীরা এটি ব্যবহার করছেননা। পেটেন্ট ফীড ব্যবহার করছেন, প্রয়োজনে অজৈব সার ব্যবহার করছেন । অনেকে পরিশোধন করে গোবরও ব্যবহার করছেন ।

৫.০ চিংড়ি চাষের আওতায় জমির পরিমান বৃদ্ধি ঃ ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২৪টি ছোট বড় জলাশয়ে গল্দা চিংড়ির মিশ্র চাষে জমির পরিমান ছিল ১,৫০০ একর। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৬১টি মৎস্য চাষ প্রকল্পে ১,৯৪৫ একর জলাশয় গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের আওতায় আসে।

- ✓ শুধুমাত্র দাউদকান্দি এলাকায় ৭৩টি প্লাবনভূমির জলাশয়ে গলদা চিংড়ির জুভেনাইলের চাহিদা রয়েছে এক কোটি বিশ লাখ ।
- ✓ সমগ্র প্রকল্প এলাকায় (দাউদকান্দি, চান্দিনা, দেবিদ্বার ও আখাউড়া) সমষ্টিগতভাবে জুভেনাইলের চাহিদা রয়েছে প্রায় ৪-৫ কোটি।
- ✓ দ্রুত সম্প্রসারণশীল এ মিশ্র চাষ হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল সম্ভাব্য জলাশয়ে নিবিড়ভাবে চাষের প্রচলন ঘটলে প্রতি মৌসুমে ৭-৮ কোটি জুভেনাইলের প্রয়োজন হবে।

পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাবে অনেক চাষী কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে জুভেনাইল মওজুদ করতে পারছেননা। চাষীরা বর্তমানে প্রতিটি জুভেনাইল ৮ থেকে ১০ টাকায় ক্রয় করছেন। এ অসুবিধা দূর করার লক্ষ্যে ফেডেক প্রকল্পের আওতায় গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনের একটি হ্যাচারী স্থাপন করা হয়েছে। এ হ্যাচারী হতে এ বছর গলদা চিংড়ির পিএল সফলভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হলে এ অঞ্চলের চাষীরা প্রতিটি জুভেনাইল ৩ থেকে ৪ টাকায় ক্রয় করতে সমর্থ হবেন। এর ফলে এ অঞ্চলে গলদা চিংড়ির চাষের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

৬.০ চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে প্রকল্পভূক্ত ২৪টি জলাশয়ে গলদা চিংড়ির উৎপাদন ছিল প্রায় ৫০,০০০ কেজি। প্রতি কেজি ৫০০ টাকা দরে এসব চিংড়ি বিক্রি করে চাষীদের আয় হয়েছিল প্রায় আড়াই কোটি টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৬১টি জলাশয়ে গলদা চিংড়ির মোট উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৯০,০০০ কেজি, যা প্রতি কেজি ৭০০ টাকা দরে বিক্রি করে চাষীরা আয় করেছেন ৬,১২,৫০,০০০ টাকা। বাজার সংযোগ কর্মশালা আয়োজনের ফলে চাষীরা সহজেই তাদের উৎপাদিত চিংড়ি বিক্রি করতে পারছেন। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বর্তমান বছরে গলদা চিংড়ির আওতায় জমির পরিমাণ, মওজুদকৃত জুভেনাইলের সংখ্যা, উৎপাদন এবং এ চাষ হতে চাষীদের আয়ের তথ্যসমূহ

পর্যালোচনায় লাভজনক এ চাষে চাষীদের আগ্রহ স্পষ্টতই দৃশ্যমান হচ্ছে। গলদা চিংড়ি চাষের পূর্বে একর প্রতি মাছ চাষীদের আয় ১.৫ থেকে ২.০ লক্ষ টাকা ছিল। গলদা চিংড়ির পিএল-এর অভাবে সব জলাশয়ে নিবিড়ভাবে গলদা চিংড়ির চাষ করা সম্ভব হয়নি। যে অল্প কয়েকটি জলাশয়ে উচ্চমূল্যমানের এ মাছের নিবিড় চাষ হয়েছে, সেসব জলাশয়ে একর প্রতি চাষীদের আরো ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ টাকা অতিরিক্ত আয় হয়েছে। অর্থাৎ গলদা চিংড়ি চাষে চাষীদের আয় একর প্রতি প্রায় ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও গলদা চিংড়ির পিএল হতে জুভেনাইল উৎপাদনের মাধ্যমে নার্সারী পুকুরের চাষীরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আয় করেছেন। প্রতিটি ২-৩ টাকা দরে পিএল ক্রয় করে নার্সারী পুকুরে লালন-পালনের পর উৎপাদিত প্রতিটি জুভেনাইল চাষীরা ৮-১০ টাকা দরে বিক্রি করেছেন। গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে নার্সারী পুকুরে পিএল হতে জুভেনাইল উৎপাদনের লাভজনক এ কর্মকান্ডে আরো অনেকের সম্পৃক্ততা বাড়বে।

গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষে একর প্রতি খরচ ও আয়ঃ একর প্রতি ৪,০০০ জুভেনাইল ছাড়া সম্ভব। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি জুভেনাইল ১০ টাকা হারে খরচ হবে ৪০,০০০ টাকা। এ ক্ষেত্রে ৫০% বাঁচার হার ধরলে উৎপাদন হবে ২০০ কেজি। যার বিক্রয় মূল্য কম করে হলেও (প্রতি কেজি ৫০০ টাকা দরে) ১,০০,০০০ টাকা।

কর্মসংস্থান ঃ প্লাবনভূমি অঞ্চলের মাছ চাষীদের কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষে উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মিশ্র চাষে গলদা চিংড়ির চাষ প্রচলনের কারণে আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। তবে নতুন এ ধারণার প্রয়োগে মাছচাষীদের শ্রমঘন্টা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষে অন্যান্য মাছের উপর প্রভাব : গলদা চিংড়ি একটি নীচের স্তরের প্রাণী। জলাশয়ের নীচের স্তরের সকল প্রকার অবশিষ্ট খাদ্য ও মাছের ত্যাগকৃত মল এরা খেয়ে ফেলে। ফলে নীচের স্তরে কোন প্রকার ক্ষতিকর গ্যাস উৎপাদন না হওয়ায় মাছের বাসস্থান পরিবেশ-বান্ধব হয় এবং অন্যান্য কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। মিশ্র চাষে জুভেনাইলের খরচ ব্যতীত অন্য কোন খরচ অর্থাৎ বাড়তি কোন খাবার দিতে হয়না।

গলদা চিংড়ির সাথে অন্যান্য মাছের উৎপাদন একর প্রতি প্রায় ২,০০০ কেজি, যার গড় বিক্রয় মূল্য ১০০ টাকা অর্থাৎ প্রায় ২ লক্ষ টাকা। শুধুমাত্র দাউদকান্দি এলাকায় মোট সাদা মাছ থেকে আয় ৬০০০X২০০০ = ১২০০০০০০ কেজি। যার গড় মূল্য ১২০ কোটি টাকা।

চ্যালেঞ্জসমূহ

১. প্রকল্পভূক্ত চাষীরা প্রশিক্ষণের শিক্ষণ অনুযায়ী কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষের কৌশলসমূহ জেনে অত্যন্ত লাভজনকভাবে এ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কোন ধরনের অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই উচ্চ মূল্যমানের এ মাছ চাষে চাষীদের আয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রকল্প এলাকায় প্রকল্প বহির্ভূত অন্যান্য চাষীদের এ মিশ্র চাষে অনুপ্রাণিত করছে। কিন্তু কুমিল্লা অঞ্চলে গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনের কোন হ্যাচারী না থাকায় চাষীরা চাহিদা মত পিএল সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জুভেনাইল উৎপাদন করতে পারছেননা। খুলনা, বাগেরহাট, নোয়াখালী ও কক্সবাজার অঞ্চল হতে সংগৃহীত পিএল-এর একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ পরিবহণকালীন সময়ে মারা যায়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিএল-এর অভাবে এ মিশ্র চাষ দ্রুত সম্প্রসারিত হতে পারছেনা। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পিএল সরবরাহের উদ্দেশ্যে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ফেডেক প্রকল্পের আওতায় "গলদা চিংড়ির হ্যাচারী স্থাপন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি মৌসুমে এই হ্যাচারী হতে সফলভাবে পিএল উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি সম্ভব হলে চাষীরা প্রয়োজনীয় সংখ্যক জুভেনাইল মওজুদ করতে পারবেন।

২. গলদা চিংড়ি চাষের জলাশয় ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পুকুর প্রস্তুতিতে ৬০% ক্লোরিন সমৃদ্ধ ব্লিচিং পাউডার ও ব্ল্যাক সল্ট (সোডিয়াম ক্লোরাইড) প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু আমদানী নির্ভর এসব উপকরণ সবসময় প্রয়োজন মাফিক চাষীরা সংগ্রহ করতে পারেননা। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এসব পণ্যের গুণগত মান বজায় থাকেনা। এর ফলে পানির যথাযথ গুণাগুণ বজায় রাখা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়না, যা বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় এবং লাভজনকভাবে মাছ চাষ কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করে।

৩. গলদা চিংড়ির জুভেনাইল মওজুদ করা অন্যান্য মাছের পোনার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যয় সাপেক্ষ। প্রতিটি ৮-১০ টাকা দরে ১০,০০০ গলদা চিংড়ির জুভেনাইল মওজুদে খরচ হবে প্রায় ৮০,০০০-১,০০,০০০ টাকা। তাই অনেক লাভজনক হওয়া স্বত্ত্বেও অনেকেই পুঁজির অভাবে এ চাষ পরিচালনা করতে পারছেননা।

সুপারিশসমূহ

১. প্লাবন ভূমি অঞ্চলে কার্প জাতীয় মাছের সাথে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাছ চাষীদের আয় বৃদ্ধি করার পাশাপাশি উচ্চমূল্যের এ মাছ বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত হ্যাচারীতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন সফলভাবে করা সম্ভব হলে এ অসুবিধা কিছুটা দূর হবে। এছাড়াও ব্যাপক চাহিদা সম্পন্ন গলদা চিংড়ির পিএল উৎপাদনে বেসরকারী পর্যায়ে হ্যাচারী স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রচারণা চালানো যেতে পারে।

২. লাভজনক এ চাষে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানের বিষয়টি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক ও ঋণ প্রদানকারী সংস্থা) বিবেচনায় নিতে পারে।

কেস স্টাডি

১) নার্সারী মালিকের নামঃ মোঃ সালাহ উদ্দিন। ঠিকানাঃ গ্রাম- ধানুয়াখোলা: ডাকঘর- ইলিয়টগঞ্জ, উপজেলা- দাউদকান্দি, জেলা- কুমিল্লা। নার্সারীর আয়তনঃ ৪৫ শতাংশ। পিএল মওজুদের সংখ্যাঃ ৬০,০০০। পিএল ছাড়ার তারিখঃ ৩১/০৫/২০১০ খ্রিঃ।

জনাব সালাহ উদ্দিন গলদা চিংড়ির নার্সারী প্রস্তুত করার আগ্রহ প্রকাশ করলে সরেজমিনে তাকে নার্সারী প্রস্তুতির সকল বিষয়ে সাহায্য করা হয়। জনাব সালাহ উদ্দিন গলদা চিংড়ির নার্সারী বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হন।

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে তিনি পিএল-এর বিশ্রামের স্থান ও ঝুলে থাকার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করে দেন। এর মধ্যে শুকনো তাল পাতা স্থাপন, পুরাতন জাল আড়াআড়ি করে স্থাপন, পুরাতন পাইপ স্থাপন, বাঁশের চোং স্থাপন ইত্যাদি।

পরামর্শ মতে তিনি সন্ধ্যা থেকে শুরু করে ভোরবেলা পর্যন্ত ৫/৬ বার খাবার প্রদান করেন। প্রথম সপ্তাহে মোট শরীরের ওজনের ১০০% ও দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭০% খাবার প্রদান করেন। প্রতি সপ্তাহেই তার অবমুক্ত পিএল-এর বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

তবে পিএল ছাড়ার ২ সপ্তাহ পর্যন্ত চিংড়ির নার্সারীর ফীড বাজারে না পাওয়ায় অন্য মাছের নার্সারী খাবার সরবরাহ করা হয়। পরবর্তীকালে বাজারে খাবার পাওয়া গেলে হলে তা সংগ্রহ করে পুকুরে সরবরাহ করেন।

অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে তিনি যথাসময়ে ৩০ হাজার জুভেনাইল বা কিশোর চিংড়ি তার ব্যাবস্থাপনাধীন প্লাবনভূমিতে মওজুদ করেন এবং ৫,০০০ পিএল অন্য একটি পুকুরে ছাড়েন। অবশিষ্ট কিশোর চিংড়ি নার্সারী পুকুরে বিদ্যমান ছিল। তবে কত জুভেনাইল মওজুদ আছে তা নিয়ে শংকা প্রকাশ করেন।

সর্বশেষে যখন তাকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, তার পুকুরে কম পক্ষে ১৫,০০০ চিংড়ি রয়েছে এবং তা থেকে অর্ধেক সরিয়ে ফেলতে হবে, তখন তিনি তা করেননি। পরামর্শের ২/৩ দিন পরই গত ২৪/০৯/২০১০ তারিখে পূর্ণিমার দিন ১৮,০০০ জুভেনাইল মরে প্রমাণ করলো যে তারা ঐ পুকুরে বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে ১ কেজিতে ৮০টি জুভেনাইল পাওয়া যায় ৮০ কেজি, আর ৪৬ কেজি ছিল ২৫০টিতে এক কেজি। নার্সারীতে তার পিএল বাঁচার হার প্রায় ৯৫%। নার্সারীতে তার এ সফলতা বিরল। যা সর্বোচ্চ বাচার হার ৮০% এর চাইতে ১৫% বেশি।

মোঃ সালাহ উদ্দিনের প্রকল্পের আয় ব্যয়ের হিসাব ঃ

ব্যয় ঃ

ক) পুকুর প্রস্তুতি	ঃ ২,৬০০ টাকা
খ) শ্রমিক	ঃ ৬,০০০ টাকা
গ) সেচ	ঃ ৩,০০০ টাকা
ঘ) খাদ্য	ঃ ১৮,৪১০ টাকা
ঙ) অন্যান্য	ঃ ১,০০০ টাকা
চ) পিএল ক্রয়	ঃ ৬০,০০০ টাকা
ছ) গাড়ি ভাড়া	ঃ ৭,০০০ টাকা
মোট	ঃ ৯৮,০১০ টাকা (আটানব্বই হাজার দশ টাকা)

সম্ভাব্য আয় ঃ

পিএল	৩৫০০০×৫	= ১,৭৫,০০০ টাকা
পুকুর চাষে	৫০০০×৫	= ২৫,০০০ টাকা
মৃত জুভেনাইল বিক্রয়		= ৩১,০০০ টাকা (খরচ বাদে)
মোট		**= ২,৩১,০০০ টাকা (দুই লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা)**

** ১১,২৫০ টাকা প্রকল্প থেকে ইনসেনটিভ হিসাবে প্রদান করা হয় ।

২। আমি মোঃ সালাহ উদ্দিন, ডায়না মৎস্য প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বিগত এপ্রিল ২০১০ মাসে তিনদিন ব্যাপী গল্দা চিংড়ি নার্সারী স্থাপন বিষয়ে সিসিডিএ আদমপুর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমার নার্সারী স্থাপন বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং আমি পুকুর নির্বাচনের বিষয়ে সিসিডিএ-র টেকনিক্যাল অফিসারের শরণাপন্ন হই। তিনি এ ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন এবং পুকুর নির্বাচনে সহায়তা করেন। আমি তাঁর পরামর্শ ও প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দিয়ে ভাসখোলার এই নার্সারী পুকুর প্রস্তুত করি।

নার্সারী পুকুর তৈরীর পর পিএল প্রাপ্তির জন্য খোঁজ খবর নেই। এ ব্যাপারে সিসিডিএ-র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সক্রিয় সহযোগিতা করেন। কাছাকাছি হ্যাচারী থেকে পিএল না পাওয়ার ফলে নওগাঁ সরকারী গলদা চিংড়ি হ্যাচারী থেকে গত ৩১/০৫/২০১০ তারিখে ৬০,০০০ গলদা চিংড়ির পিএল ক্রয় করি। পিএল-এর মূল্য ১ টাকা হিসাবে ৬০ হাজার টাকা ও গাড়ি ভাড়া বাবদ ৭ হাজার টাকাসহ মোট ৬৭,০০০ টাকা ব্যয় করি।

পিএল ছাড়ার পর খাবারের প্রয়োজন হলে বাজারে খাদ্য সরবরাহকারী/খাদ্য উৎপাদনকারীদের নিকট গল্দা চিংড়ির নার্সারীর খাবার পাই নাই। পিএল ছাড়ার ২০/২২ দিন পর গলদা চিংড়ির নার্সারী খাবার পাই এবং পরামর্শ মতো খাবার সংগ্রহ করি। সময়মতো চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি ও প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করি। এ ব্যাপারে সিসিডিএ থেকে সার্বিক সহযোগিতা পাই।

পিএল ছাড়ার ১ মাস ২২ দিন পর গত জুলাই মাসের ২৩ তারিখে পিকেএসএফ-এর জনাব ফজলুল কাদের স্যার ডায়না মৎস্য চাষ প্রকল্পে জুভেনাইল ছাড়েন। ডায়না মৎস্য চাষ প্রকল্পের ৪০ একরে আমি ৩০ হাজার জুভেনাইল ছাড়ি। অন্য মাছের খাবার স্বাভাবিকভাবে সরবরাহ করি। চিংড়ির জন্য আলাদা কোন খাবার দেই নাই।

গলদা চিংড়ির জুভেনাইল ছাড়াও এ প্রকল্পে আমি নিম্ন লিখিত প্রজাতির মাছ চাষ করি ঃ

মাছের প্রজাতির নাম	সংখ্যা
সিলভার কার্প	৩০,০০০
বিগহেড	৮,০০০
কাতল	৫,০০০
রুই	৯,০০০
মৃগেল	৯,০০০
কালি বাউস	৮,০০০
বাটা	৫৫,০০০
তেলাপিয়া	১,৫৫,০০০
পাঙ্গাশ	১৭০০০
কৈ	২৫,০০০
চিতল	১,৪০০
ফলি	২,৩০০
গ্রাস কার্প	৮০০
আইড়	২,৫০০

ইতিমধ্যে আমি কার্প জাতীয় মাছ ধরা শুরু করেছি। এ পর্যন্ত মোট ৩৭,৬৩৭ কেজি মাছ ধরে ১৭ লক্ষ টাকার উপরে বিক্রয় করেছি। সর্বশেষ আমার প্লাবনভূমি চাষ থেকে গলদা চিংড়ি আহরণ করি মোট ৬০১ কেজি, যার গড় বিক্রয় মূল্য ২,৪০,৪০০ টাকা।

আমার নার্সারী পুকুর থেকে আরো ৫ হাজার জুভেনাইল অন্য একটি পুকুরে দেই। অবশিষ্ট জুভেনাইল চাষের উদ্দেশ্যে নার্সারী পুকুরে পালন শুরু করি। ৩৫ হাজার জুভেনাইল অন্যত্র ছাড়ার পরেও এত অধিক পরিমাণ জুভেনাইল নার্সারীতে ছিল, তা আমার জানা ছিলনা। তাই খাদ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা ও সংখ্যাধিক্যের কারণে আমার ১৭,৯০০ জুভেনাইল মারা যায়। যার ওজন ১৩২ কেজি, যা বিক্রয় করে আমি ৩০,৩৬০ টাকা পাই। এর মধ্যে ৮০টি চিংড়িতে ১ কেজি এরকম ৮০ কেজি ও বাকী ৫২ কেজির প্রতি কেজিতে ২১০টি ছিল।

প্রদর্শনী নার্সারী হিসাবে আমার নার্সারী পুকুর থেকে ৫৫ হাজার জুভেনাইল পাই এবং আরো ২ থেকে ৩ হাজার জুভেনাইল নার্সারী পুকুরে চাষ করছি। নার্সারীতে চাষকৃত চিংড়ি থেকে মোট ১৬৯ কেজি উৎপাদন হয়। মোট বিক্রয়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪৭,৯০০ টাকা। আমার গলদা চিংড়ির মোট উৎপাদন ৭৭০ কেজি, যার বিক্রয় মূল্য মোট ২,৮৮,৩০০ টাকা। এর বিপরীতে আমার সর্বমোট খরচ ৯৮,০০০ টাকা।

আমাদের এলাকায় সফলভাবে প্লাবনভূমিতে গলদা চিংড়ির চাষ এই প্রথম। আমি নার্সারী এবং চাষে সিসিডিএ-র দিক নির্দেশনায় সতর্ক হলে আরো ভাল ফলাফল পেতাম। ভবিষ্যতে আমি আরো বৃহৎ পরিসরে নার্সারী ও চাষের উদ্যোগ নেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছি ।

নার্সারী পুকুর ব্যবস্থাপনায় এবং চাষ করতে গিয়ে যে সমস্তসমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে ঃ

- সময়মতো পিএল-এর অভাব।
- সময়মতো গলদা চিংড়ির নার্সারীর অভাব।
- চাষের উপকরণ যেমন ব্লিচিং পাউডার ও অপরিশোধিত লবণের অভাব।

আমার মতে এলাকায় গলদা চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণের জন্য একটি আধুনিক মানের চিংড়ি হ্যাচারী যথাশীঘ্র স্থাপন অতীব জরুরী। খাবার সঠিক সময়ে পাওয়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া ও চাষের উপকরণ আগেভাগে সংগ্রহ করে রাখার ব্যাপারে সিসিডিএ-র সহযোগিতা কামনা করছি।

সংযুক্তি

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পভূক্ত প্লাবনভূমি অঞ্চলে বিভিন্ন মৎস্য খামারে মওজুদকৃত জুভেনাইল ও চিংড়ির উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	সদস্য সংখ্যা	জলাশয়ের আয়তন (একর)	উৎপাদন (কেজি)
০১	মোঃ সালা উদ্দিন সরকার	৫	১.৪০	১৫০
০২	ডায়না মৎস্য প্রকল্প	৩৫	৪০	৯০০
০৩	আপুসি মৎস্য	১৬০	৭৫	৫৫০
০৪	প্রকল্প প্রশান্ত মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৩	৩৬০	১৩০০০
০৫	আইডিয়াল মৎস্য চাষ প্রকল্প	১	২.০০	৩০০
০৬	মৈত্রী মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৭	১৫০	১০০০
০৭	বাসরা ফিসারিজ	১৮৮	৯৬	১৩৬০০
০৮	খিরাই মৎস্য প্রকল্প	২৩৫	১৬৫	৫৫০০
০৯	পানকৌড়ি ফিসারিজ লিমিটেড	৩০৯	২১৭	৮০০০
১০	ফাইভ স্টার মৎস্য প্রকল্প		১৮	১৯০০
১১	বিসমিলাহ মৎস্য প্রকল্প	৮০	২৪	১৭২৫
১২	হাজী মৎস্য প্রকল্প	১৮২	২২৫	৫৫০০
১৩	একতা মৎস্য প্রকল্প	২৬০	১৫০	১০০০০
১৪	বহুমুখী মৎস্য প্রকল্প	১৫০	৭৩.৫	৭০০০
১৫	মিতালী মৎস্য প্রকল্প	৫	২১০	১০০০০
১৬	মোহাম্মদপুর হ্যাচারী	১	০.৫০	৫০

১৭	ডাঃ আব্দুল হালিম	১	০.৩৩	৫০
১৮	সৈয়দ আবুল হাসান	১	১.৪০	৬০
১৯	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	১	৫.৫০	৩৫০
২০	মোহাম্মদ আলী	১	০.৩৩	৫০
২১	মোঃ জসিম উদ্দিন খান	১	০.৪০	৭০
২২	মোঃ মিজানুর রহমান	১	১.২০	১৫০
২৩	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	১	৩.৬০	৪০০
২৪	মোঃ মফিজুল ইসলাম	১	২.১০	৫০০
২৫	খোকন চন্দ্র দে	৩	১.৭৬	৪০০
২৬	আব্দুল বাতেন	১	৫.২০	২০০
২৭	মোঃ নুরুল হক ভূইয়া	১	২.০০	৩০০
২৮	আব্দুল মান্নান	১	২.১০	৩০০
২৯	মোঃ মোবারক মেম্বার	২	৩.৫২	৩০০
৩০	গঙ্গাসাগর মৎস্য চাষ প্রকল্প	২৫	২১.৫	১০৫০
৩১	মোঃ মোমেন মুন্সি	১	.৭৫	৫০
৩২	মোঃ মাহবুব আলম	১	.৬০	৫০
৩৩	মোঃ আঃ ছামাদ	১	১.৮	১০০
৪	মোঃ আনোয়ার হোসেন	১	.৬০	৫০
৩৫	মোঃ আনোয়ার হোসেন	১	.৫০	৪০
৩৬	মোঃ খলিরুর রহমান	১	:৩০	৩০
৩৭	মোঃ আ: মান্নান	১	.৩৩	৩০
৩৮	মোঃ মনির হোসেন	১	.৪০	৪০
৩৯	তাহমিনা আক্তার	১	.৪০	৫০
৪০	মোঃ জাকির হোসেন	১	.১৮	২০

৪১	মোঃ জাকির হোসেন আজাদ	১	.৪০	৫০
৪২	মোঃ আব্দুল হালিম	১	.৫৫	৬০
৪৩	আলেয়া আক্তার	১	.৭৫	২০০
৪৪	দুলাল সরদার	১	১.০	২০০
৪৫	মাছুম	১	.৭০	১৫০
৪৬	গিয়াস উদ্দিন	১	৭৫	১৫০
৪৭	লিটন	১	.৬০	১০০
৪৮	রানা মিয়া	১	.৬৫	১০০
৪৯	অদুদ ভূইয়া	১	১.০	২০০
৫০	নিজাম উদ্দিন	১	.৮০	১৫০
৫১	হালিমা বেগম	১	.৬০	৬০
৫২	মোঃ জাকির	১	.৭৫	৭৫
৫৩	আঃ মমিন	১	.৬০	৫০
৫৪	শাহনাজ বেগম	১	১.০	২০০
৫৫	মোবারক হোসেন	১	.৭৫	৬০
৫৬	মোয়াজ্জেম হোসেন	১	.৮০	৭০
৫৭	মাঈন উদ্দিন	১	.৬০	৬০
৫৮	সেলিম তালুকদার	১	.৯০	৮০
৫৯	নাসির	১	.৫০	৪০
৬০	ইসমাইল	১	.৭০	৬০
৬১	সেলিম খান	১	.৭৫	৭০
	মোট		১৯৫৪	৯০০০০

প্লাবনভূমিতে উৎপাদিত গলদা চিংড়ি

সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসটেন্স (সিসিডিএ)
১০৯ পার্ক রোড (দোতলা) নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬
ফোনঃ ৮৭১৩১৩৭, ৮৭১১২১৫ মোবাইলঃ ০১৭১৪১৬৬১২৫
ই-মেইলঃ ccdabd@gnbd.net.bd